শান্তির অন্বেষা

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

শান্তির অন্বেষা

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

হোসাইনিয়া কুতুবখানা, সিলেট।

শান্তির অন্বেষা
প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশকঃ মোঃ আবদুস সালাম
হোসাইনিয়া কুতুবখানা
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

প্রকাশকালঃ এপ্রিল, ২০২৩

মূল্যঃ ষাট টাকা মাত্র।

Search for Peace
By Professor Dr. Syed Badiuzzaman Faruque

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ও আম্মাজান, দাদাভাই ও ফরিদ ভাইজানের মাকাম বুলন্দি্র আশায়

তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সূচী

১। ভূমিকা/৬
২। ইসলামের ভিত্তি যে পাঁচটি আমলে/৮
৩। ঈমান ও ইহসান কী?/১০
৪। শান্তির অভাব কেন?/১৩
৫। শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে?/১৪
৬। শান্তির প্রধান উৎস/১৬
৭। আল কুরআন পাঠের আদব/১৮
৮। যিকির ও মুরাকাবা/২০
৯। সমাপনি বক্তব্য/২২

১. ভূমিকা

বর্তমান এই যুগে আধুনিক মানুষের একটি বড় প্রশ্ন হলো- যদি প্রভু দয়াময় ও মেহেরবান হয়ে থাকেন, তবে বিশ্বব্যাপি ব্যক্তিমানুষ ও সমষ্টিগত সমাজে এত অশান্তি ও দুঃখ যাতনা কেন? এই প্রশ্নের জবাব সহজ নয়। আল্লাহতায়ালা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র-সূর্য, প্রাণীজগত। দুঃখ যাতনায় ভোগে কেবল মানুষই। অপরাপর সৃষ্টির চেতনা নেই-তবে যাদের আছে তা নিম্ন পর্যায়ের। ঐরকম চেতনা দিয়ে দুঃখ যাতনা-সুখ দুঃখ উপলব্ধিতে আসেনা। মানুষের চেতনা অতি উচ্চ পর্যায়ের। তাই মানুষ সহজেই দুঃখে দুখী হয়, সুখে উদ্বেলিত হয়। প্রশ্নটি ছিল- আল্লাহ দয়াময় হবার পরও কেন মানুষকে এত দুঃখ যাতনা দিয়ে থাকেন।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, তখন প্রশ্নটি আরো বড় হয়ে ধরা পড়ে। অনেকে বলেন, আল্লাহ কি পারেন না মানুষকে এ জীবনের মাঝেই জান্নাতি সুখের পরশ দিতে? এসব প্রশ্ন খুবই জটিল এক অধ্যায়ের দিকে ইঙ্গিত দেয়। আর এই অধ্যায় অনেক মানুষকে ধর্ম অস্বীকার করে নাস্তিক বানিয়ে নিচ্ছে। নাস্তিক হওয়া সহজ। কারণ অসংখ্য নেতিবাচক ভাবনা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে।

আমার প্রশ্নটি একটু অন্যরকম। এটি হলো এই যে, সৃষ্টি জগতে ঐক্য আছে আর এই ঐক্য কিসের ইঙ্গিত দেয়? জবাব সহজ। সৃষ্টি জগতে ঐক্য একজন একক ও ঐক্যময় স্রষ্টার দিকে আমাদের ধাবিত করে। তিনি আল্লাহ।

পৃথিবীর বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পরীক্ষা নেয়া হয়- তখন ছাত্ররা অসংখ্য প্রশ্নের জবাব লিখতে বাধ্য হয়। কিন্তু সবার সব জবাব সঠিক হয় না। সঠিক জবাবটি জানা থাকে প্রশ্নকর্তার নিকট যিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন। আমাদের আটপৌরে জীবনের বেলায়ও এমনই। আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি। প্রশ্নকর্তা একজন। তিনি আল্লাহ। সকল প্রশ্ন যা আল্লাহ করেন- তার সঠিক জবাব ও প্রশ্নটির উদ্দেশ্য এক আল্লাহ জানেন। সুতরাং সঠিক জবাব পেতে হবে- আল্লাহর নিকট থেকেই। প্রথম প্রশ্নঃ আল্লাহ কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নঃ মানুষের উপর এত বিপদ আপদ কেন? তৃতীয় প্রশ্নঃ মৃত্যুর পরও কি জীবন আছে? যদি থাকে সে জীবনের উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্নগুলো নিয়ে কিছু কথা বলব বলেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার অবতারণা। সকল মানবীয় প্রশ্নের ঐক্যময় রূপটি হলো- শান্তি পাব কোথায় এবং কখন? কারণ এখন দুঃখ যাতনায় ভুগছি। এর অবসান কখন হবে? কখন দুঃখ যাতনা শেষ হয়ে- সুখ শান্তি আসবে। কেবল এতটুকুই নয়- প্রশ্ন এটিও যে- এ জীবনে কি শান্তি পাওয়ার উপায় আছে? যদি থাকে তবে কি সেই উপায়? সেই শান্তির ঠিকানা কী? যদি সেই শান্তি মিলে তবে কি কষ্ট-যাতনা--দুঃখ-বেদনা দূরীভূত হয়ে যাবে? এসব আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে গ্রন্থটি পুরোটাই পড়ুন এবং কাজে লাগান।

২. ইসলামের ভিত্তি যে পাঁচটি আমলে

যখন মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও মালিক, তখন তার কাছ থেকেই জানতে হবে তিনি কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন। আর এই জানাটা হতে হবে আল্লাহর কালাম আল-কুরআন ও রসুলুল্লাহর হাদীস থেকে। আল্লাহ আল-কুরআনে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে বলেন, “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্যে যে তারা কেবল আমারই বন্দেগী করবে।” (আল-কুরআন ৫১:৫৬)।

আল্লাহকে স্রষ্টা ও মালিক মানা হলো আকীদা। বুঝা গেল মানুষকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছে- কেবল আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের প্রধানতম ও প্রথম স্তম্ভ এটি। বন্দেগীর রয়েছে চারটি শাখা। (১) সালাত (২) সিয়াম (৩) হজ্ব, (৪) যাকাত প্রদান। এই চার ধরনের বন্দেগীর প্রতিটিতেই পূর্ণতার তারতম্য রয়েছে। পরিপূর্ণ বন্দেগীর মোটে একটি শর্ত। সেটি হলো- ইহসান। ইহসান কী? ইহসান হলো আল্লাহর বন্দেগী এমনভাবে করতে হবে যেন মনে একথাটি থাকে যে- আল্লাহকে আমি দেখছি। যদি এ স্তর অর্জনের জন্য সঠিক জ্ঞান ও শক্তি না থাকে তবে- এ কথা অবশ্যই মনে থাকতে হবে যে- আল্লাহতো আমায় দেখছেন!

এখানে একটি নেতিবাচকতা বিষয় রয়েছে। সেটি হলো-লৌকিকতা। অর্থাৎ এ ধারণা পোষণ করা যে- মানুষ দেখছে আমি আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত। না -এটি করা যাবে না। সালাত, সিয়ামসহ সকল ইবাদাতে উদ্দেশ্য থাকবে যে- আল্লাহ দেখুন আর আমি দেখি। আমি দেখি যে আমি আল্লাহ কে দেখছি। আর আল্লাহ আমার ইবাদাত দেখছেন- এবং আমার ইবাদাত খালেছ আল্লাহর জন্য হচ্ছে কিনা তা আল্লাহ অবশ্যই জানবেন। ইহসান ছাড়া ইসলাম অচল পয়সা। যাকাত দেবার বেলায় মনে থাকতে হবে যে- আল্লাহ দেখছেন আমি দিচ্ছি। হজ্বতো পুরোটাই আল্লাহ কে দেখাবার জন্য। কারণ এতে কায়িক পরিশ্রম ও আর্থিক ব্যয় রয়েছে। সিয়ামের বেলায় এই ইহসান সম্পূর্ণ ফুটে উঠে। কারণ- কেউ জানে না আমি রোজা ভেঙ্গে ফেলছি কিনা কিংবা রোজা পূর্ণভাবে রাখছি কিনা। একমাত্র আল্লাহই সাক্ষী যে- আমি রোজা রাখছি। মোট কথা- বন্দেগীর সকল শাখায় মন পূর্ণভাবে আল্লাহয় নিবিষ্ট থাকবে। তা হলেই ইবাদাত পূর্ণ হবে। ইহসান সঠিকভাবে চর্চিত হবে।

উপরোল্লিখিত পাঁচটি কর্ম ইসলামকে পালনের শর্ত। ইসলাম পালন বা কায়েম করার জন্য এই পাঁচটি কর্ম সাধন করতে হবে। আর সকল ইবাদাতে ঈমানকে সামনে রাখতে হবে আর রাখতে

হবে ইহসানকেও। আর যখন ইসলাম পূর্ণভাবে চর্চিত হবে তখন জীবনে শান্তি নেমে আসবে। দুঃখেও দুঃখিত হবে না, সুখেও আনন্দে ভেঙ্গে যাবে না।

আকীদা, সালাত, সিয়াম, হজ্ব ও যাকাত প্রদান ইসলাম ধর্মের পাঁচ স্তম্ভ। তবে জীবনতো কেবল স্তম্ভ বা খুঁটি দিয়ে বানানো ঘরের মত নয়। পূর্ণতা প্রাপ্ত ঘর হলো যার রয়েছে চার দিকে দেয়াল ও উপরে ছাদ। সুতরাং উপরোল্লিখিত পাঁচ স্তম্ভই কেবল ইসলাম নয়। ইসলামের পূর্ণতা আসে পাঁচটি শাখায় ঃ (১) আকীদা, (২) ইবাদাত, (৩) লেনদেন, (৪) সামাজিকতা ও (৫) চরিত্র।

এই পাঁচটি শাখার প্রথম দুটি হলো- ইসলামের স্তম্ভ বা খুটি। এখন মনে রাখুন যে আকীদা একটি সার্বক্ষণিক ইবাদাত। মানুষকে কখনোই আকীদা বিরোধী কোন কিছুতে লিপ্ত হতে দেয়া যাবে না। দ্বিতীয় শাখাটি হলো ইসলামের অপর ৪টি স্তম্ভ। তবে এগুলো সুনির্দিষ্ট সময়ে চর্চা করা লাগে। সালাত দিনে পাঁচ বার, সিয়াম বছরে একমাস, যাকাত বছরে একবার ও হজ্ব জীবনে একবার করতে হয়।

ফলে দেখা যাচ্ছে-আকীদা একটি তরল যা কি না মুসলিমকে সর্বদা ভিজিয়ে রাখে। ইবাদাত একটি ঘরের স্তম্ভের মত যা কি না ব্যক্তিকে দৃঢ়তা দেয়। বাকী তিনটি শাখাও তরলের মত। কখনোই লেনদেনে ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থি কিছুকে আমলে নেয়া যাবে না। নিদ্রা, জাগরন, পেশা, কেনাকাটা, অন্যের সঙ্গে কৃত ওয়াদা, ঋণ নেয়া দেয়া সবকিছুতে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে- ইসলাম বিরোধী কিছু হচ্ছে নাতো? পরবর্তী শাখা হলো সামাজিকতা। যেমন-আত্মীয়তা করা, বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলামেশা, অতিথি আপ্যায়ন ও নিজে অন্যের অতিথি হওয়া- সকল বিষয়ে ইসলামের নির্ধারিত রীতিনীতি রয়েছে যার বাইরে যাওয়া মানে ইসলামকে না মানা। সন্তান পরিপালন, সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের বিয়েশাদী সকল বিষয়ে ইসলামের নিয়মনীতি মানতে হবে। সর্বশেষ শাখা হলো আখলাক বা চরিত্র। চরিত্রকে করতে হবে দৃঢ়চেতা মুসলিম চরিত্র। কারো সাথে ঝগড়া বিপদে লিপ্ত না হওয়া, মনকে সর্বদা আল্লাহমুখী রাখা, আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ) এর আনুগত্য সর্বদা করা- এগুলো চারিত্রিক ইসলাম। চরিত্রকে ইসলামী বানানো ও দৃঢ়ভাবে ইসলাম অনুসরণ চরিত্রকে- ইসলামী -বানায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে- ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি ও শাখা-প্রশাখাও পাঁচটি। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে ইসলামের স্তম্ভ হলো আটটি। আকীদা ও ইবাদাতের মধ্যে পড়ে পাঁচটি শাখা- বাকী তিনটি হলো- লেনদেন, সামাজিকতা ও চরিত্র। এই আটটি বিষয়ে ইসলামী হলে- ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে মুসলিম হয়।

৩. ঈমান ও ইহসান কী?

ক) ঈমান

ঈমান অর্থ বিশ্বাস পোষণ। কিসের বিশ্বাস? বিশ্বাস হলো প্রথমত- স্রষ্টা, পালনকর্তা, কর্ম বিধায়ক, জীবন-মৃত্যুর ফয়সালাকারী এবং জীবনের সকল কিছুর নিয়ন্তা হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেয়া ও তার আদেশ পালন করা। ঈমান তরলের মত একজন মুসলিমকে সবর্দা ভিজিয়ে রাখে। ভালো-মন্দ সকল অবস্থায় আল্লাহয় বিশ্বাস রাখা কর্তব্য। এজন্যেই বলতে হয়- আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি সর্বদা, সর্বত্র, সর্বাবস্থায়।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বাস রাখতে হয়- ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও তাদের কর্মে। মানুষ মন্দ-ভালো দুটোই হতে পারে। কিন্তু ফেরেশতাদের মন্দ বলে কিছুতে অংশগ্রহণ নেই। তারা নিষ্পাপ ও জ্যোর্তিময় ও জ্যোতির দ্বারা সৃষ্টি। আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের কতককে বেশী মর্যাদা, কতককে এর নীচে স্থান দিয়েছেন। প্রধান ফেরেশতা চারজন। যথা- জিবরীল (আঃ), মিকাঈল (আঃ), ইসরাফিল (আঃ) ও আজরাইল (আঃ)। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কর্মকান্ডের ভারপ্রাপ্ত হিসেবে আল্লাহ নিয়োজিত করেছেন। অতঃপর মর্যাদাবান হলেন- আরশবাহী ফেরেশতাগণ। মহাবিশ্বের সর্বত্র ফেরেশতা রয়েছেন।

প্রকৃতিকে তার কাজ সঠিকভাবে করার জন্যও ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের শক্তিমত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, কর্মকুশলতা সবই আল্লাহয় নিবেদিত।

তৃতীয় যে বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হয় তা হলো- রসূলগণের (আঃ) উপর নাযিলকৃত কিতাব যেগুলোকে এককথায় আসমানী কিতাব বলা হয়। চতুর্থ বিশ্বাস্য বিষয় হলো-নবী রসূলের উপর বিশ্বাস। এটা এমন যে- সহজেই ভুল হতে পারে। তবে খাঁটি ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য হলো- এই বিশ্বাস পোষণ করা যে- আল্লাহ মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার জন্য গাইড হিসেবে কিছু মানুষকে নবী ও রসূল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও রসূল হলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আর সর্ব প্রথম মানব ও প্রথম নবী হলেন- হযরত আদম (আঃ)। নবীদের মধ্যে মর্যাদায় কমবেশী রয়েছেন। এ হিসেবে আমাদের নবীর পরই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হযরত ইবরাহিম (আঃ)। প্রধান কজন নবী হলেন- হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহিম (আঃ), হযরত ইসমাইল (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)। পঞ্চমত বিশ্বাস রাখতে হয় তকদিরের উপর।

জীবনের ভালো-মন্দ সকল বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এটিই তকদির। বিশ্বাস রাখতে হয়- মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে। অর্থাৎ এ সৃষ্টিজগত আল্লাহ একদিন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেবেন। একে বলা হয় কেয়ামত। অতঃপর আল্লাহ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। মানুষদেরে পুনরায় জীবিত করবেন ও তাদের পার্থিব জীবনে কৃত ভালোমন্দ কর্মের প্রতিফল দেবেন। প্রতিফল হিসেবে- মানুষ হয় সুখময় জান্নাতে অনন্ত জীবন পাবে নতুবা শাস্তির জন্য দোযখে পাঠানো হবে।

এ কয়টি বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করেই একজন মানুষ মুসলিম হয়। একটু কথা রয়ে গেল- বিশ্বাস কেবল অন্তরে রাখলেই হবে না। একে মুখের ভাষায় প্রচার করতে হবে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে যে- হ্যাঁ- আমি মুসলিম বা বিশ্বাসী তথা আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সাঃ) এর আনুগত্যকারী।

(খ) ইহসান

ইহসান-শব্দটির সাধারণ অর্থ ‘উত্তম’। পারিভাষিক অর্থ হলো- আল্লাহর বন্দেগী করার সময় ধ্যানের মধ্যে থাকতে হবে যে- আমি তো আল্লাহ কে দেখছি। যদি এই ধ্যান কষ্টকর বা অসম্ভব হয় তবে এতটুকু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে- আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এই দ্বিতীয় ভাবটি একটি তরলের মত। এটি যেন সারাক্ষণ বান্দাকে ভিজিয়ে রাখে। সবসময় মনে পড়তে থাকে আল্লাহর নাম, আল্লাহর দৃষ্টি যে কাউকে কখনোই ছেড়ে যায় না- এটি মনে থাকার নামই হলো ইহসান।

ইহসানের এরূপ ভাব থেকে জন্ম নিয়েছে- একটি বিশ্বজনীন ধর্মভাব। তাকে বলা হয়- তাসাউফ। তাসাউফ হলো- ইবাদাতে এমনভাবে ব্রত হওয়া যেন- কিছুতেই কখনোই আল্লাহর স্মরণ থেকে মন না সরে। এজন্যেই শায়েখগণ তাদের শিষ্যদের শিক্ষা দেন তাসবিহ ও যিকির। এগুলো ফরজ ইবাদাতের বাইরের ইবাদাত তথা মুস্তাহাব। হযরত রসূল করীম (সাঃ) রাতের বেলা অর্ধরাত বা একটু কম বা বেশী সময় ধরে নামায আদায় করতেন। এটি হলো তাহাজ্জুদ। এ থেকে উম্মতের মাঝে ইহসানের চর্চা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাহাজ্জুদ আদায়ের মধ্যে নিহিত। এছাড়াও রয়েছে- সকল সাধনায় আল্লাহর স্মরণ তথা তাসবিহ। সকাল-সন্ধ্যার প্রসিদ্ধ তসবিহ হলো ছয় তসবিহ। আর রাতের বেলায় ইশার নামাযের পর কিংবা তাহাজ্জুদের পর বার তাসবিহের যিকির। এই যে তাসবিহ ও যিকির, এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে থাকে। আর অন্তর এমনভাবে সেজে উঠে যে- আল্লাহ ছাড়া আর কেউ চিন্তাতেই আসে না। নফল ইবাদাতের মধ্যে -আরেকটি

হলো আল কুরআন তেলাওয়াত ও গবেষণা। হাদীস অধ্যয়ন ও তার মাধ্যমে রসূল করীম (সাঃ) এর আনুগত্যের মাঝে ডুবে থাকা।

এইসবই হলো ইহসানের শাখা প্রশাখা। ইহসান যত শক্তি পাবে- বান্দা ততই আল্লাহমুখী হবে। তার মধ্যে মানুষের ভয়ের জায়গায় আল্লাহর ভয় স্থান করে নেবে। রিযিকের জন্য মানুষের নিকট চাওয়া থেকে বিরত থেকে- আল্লাহর উপর ভরসা করা হবে। আর খানা-পিনা বিলাস-ব্যাসন ইহসানওয়ালার কাছে নগন্য হয়ে সেস্থানে আল্লাহর স্মরণ আর আল্লাহর প্রেম জেগে উঠবো। ইহসান অবলম্বন না করে সালাত সিয়ামসহ যত ফরজ ওয়াজিব পালন করা হোক তা- প্রাণহীন। ইবাদাত, লেনদেন-সামাজিকতা সর্বক্ষেত্রে ইহসানের ভূমিকা রয়েছে। ইহসানই সকলক্ষেত্রে বান্দাকে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (সাঃ) আনুগত্যে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে।

তো ঈমান বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান কিন্তু ইহসান দৃশ্যমান হয় না। তবে ইহসান যখন পাকোপোক্ত হয় তখন- ইবাদাতের মধ্যে তার প্রভাব পড়ে ও সেই প্রভাব দৃশ্যমান হয়। তখন- বান্দা নিজে না বললেও বুঝমানেরা বলতে পারেন যে, লোকটি সুফী। অর্থাৎ বান্দা তাসাউফের অনুসরণকারী।

সুফীদের জীবন যত কষ্টকরই দেখাক না কেন- সুফী নিজে কষ্ট পায় না। তার অন্তর আল্লাহ প্রেমে এমন বিভোর থাকে যে- দুঃখ-কষ্ট, সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে উঠে যায়। ইসলামের ইতিহাসে আলেম ওলামা যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন- তারা সকলেই ছিলেন সুফী। নিকট অতীতে আমাদের দেশে- হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), হযরত হাফিজ্জী হুজুর (রহঃ), আল্লামা মুশাহিদ বায়ামপুরী (রহঃ) যেমনভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন- এমনটি অন্যান্য সাধারণ আলেমদের মধ্যে বিরল।

ঈমান মুসলিম হবার দরজা আর ইহসান হলো- মুমিনের জীবনকে পূর্ণ মুসলিম হবার জন্য একটি তরল ঔষধ যে তরল বান্দাকে সর্বক্ষণ আল্লাহমুখী করে রাখে।

৪. শান্তির অভাব কেন?

শান্তি একটি মানসিক ব্যাপার। কারো মন যদি পজেটিভ চিন্তায় অভ্যস্ত হয় তবে ছোট খাটো বিপদে সে মোটেই চিন্তিত হয় না। অন্যদিকে, নেগেটিভ চিন্তাধারায় যারা অভ্যস্ত তারা ছোট বড় সব দুঃখ কষ্টকে নিজের উপর অন্যের অবদান বলে ভাবে। এখানে অন্য বলতে আস্তিকদের বেলায় খোদা আর নাস্তিকদের বেলায় প্রকৃতি বুঝতে হবে। অর্থাৎ মানুষ দুভাগে বিভক্ত। একদল দুঃখ-কষ্টকে খোদার দেয়া শাস্তি, অন্যদল প্রকৃতির দেয়া শাস্তি বলে ধরে নেয়।

এভাবে দেখলে বিষয়টি খুব সহজ। নেগেটিভ চিন্তায় অভ্যস্ত মানুষেরা কখনোই মনে শান্তি পায় না। আর পজেটিভ চিন্তাধারীরা সর্বাবস্থায় শান্তি খুজে পায়।

অশান্তির একটি বাস্তব ভিত্তিও আছে। কিছু মানুষকে আল্লাহতায়ালা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দুঃখকষ্টে ফেলেন। যদি ব্যক্তি এতে সবর করে ও আল্লাহর উপর খুশী থাকে তবে সে পরীক্ষায় পাশ। এই পরীক্ষা আল্লাহ নেন কেবল ঐসব লোকের মধ্যে যারা পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে। অর্থাৎ ঈমান এনেছে। আল্লাহ মুমিনদেরকে আখেরাতে উচু নীচু বিভিন্ন গ্রেডে ফেলে পুরষ্কার দেবেন। এই পুরষ্কার দেয়ার নিমিত্তেই পার্থিব জীবনে মুমিনদেরকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এই সকল মুমিন যারা পরীক্ষিত হচ্ছে তারা সর্বদা সবর ও আল্লাহর উপর রাজীখুশী থাকে। তাদের অন্তরে অশান্তি বাসা বাধে না। মুমিন ব্যতিত যারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে তারা তা করে কেবল পার্থিব জীবনের উপকরন হিসেবে। অন্যকথায়- এটা শাস্তিও বটে। কাফেররা দুনিয়াতে শাস্তি পায়- আখেরাতে তো পাবেই। এজন্যে শান্তির অভাব দেখা দেয় মানুষের জীবনে। শান্তির অভাব মুমিন-কাফের সকলের জীবনেই দেখা দেয় কিন্তু মুমিনেরা শান্তির অভাব অনুভব করে না। তাদের শান্তি অটুট থাকে। মুমিনদের অবস্থা অভাবনীয়। তারা কিছু পেলে শুকরিয়া আদায় করে- আর অভাবে পড়লে সবর করে। সুতরাং দুই অবস্থাতেই তাদের মনের শান্তি বজায় থাকে। শান্তির অভাব কেবল কাফেরদের মনেই বিরাজ করে। কারণ, তারা কৃতজ্ঞ নয়, ধৈর্যশীলও নয়।

শান্ত্বির অভাব দূর হয়ে সর্বাবস্থায় শান্তিতে থাকতে হলে আল্লাহকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে। কষ্টেও, সুখেও। কষ্ট আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা দূর হবার ব্যবস্থা হবে ভেবে ধৈর্যধারণ করা মুমিনের স্বভাব। সুখ আসলে- তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ভেবে মুমিন কৃতজ্ঞচিত্তে আল্লাহ কে স্মরণ করে।

৫. শান্তি কোথায় পাওয়া যায়?

মানুষের যখন অর্থবিত্তে অন্যের মুখাপেক্ষি হবার প্রয়োজন হয় না, তখন তাঁর মন শান্ত থাকে। সে শান্তি পায়। অনুরূপ, যখন মানুষ শক্তিশালী ও সাহসী হয়, অন্যের ভয় তার অন্তরে প্রবেশ করে না। এই দুই অবস্থাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তার প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ও তাঁকে স্মরণ করতে। এই দুটি বিষয়ই আল্লাহ তার কালামে পাকে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, “যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় শান্ত হয় আল্লাহর স্মরণে। জেনে রাখো- আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় সমূহ প্রশান্ত হয়।” (সূরা রা’দঃ২৮)।

ইসলামের যত ধরণের ইবাদাত বন্দেগী রয়েছে সবই আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। যেমন সূরা তোয়াহায় আল্লাহ বলেন,“নিশ্চয় আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। সুতরাং আমার বন্দেগী কর। সালাত আদায় কর আমাকে স্মরণ করার জন্য।” (সূরা তোয়াহাঃ ১৪)। এভাবে সালাত তো বটেই-অন্য সকল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ইবাদাত আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যই। অতঃপর রয়েছে, নফল ইবাদাত। নফল ইবাদাত বান্দাকে আল্লাহর অতি নিকটবর্তী করতে সাহায্য করে। এজন্যেই ইসলামের সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে নফল ইবাদাত পালন আবশ্যকীয় করেন শায়েখগণ। নবী করীম (সাঃ) অনেক অনেক নফল বন্দেগী করতেন। যেমন-রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করা। সালাতের মধ্যে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর (সাঃ) পা ফুলে যেত।

তিনি নিজে অভূক্ত থেকেও অভাবীকে দান খয়রাত করতেন। এই গেলো প্রথম বিষয়টি। ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে নবী করীম (সাঃ) এর সাহসী ভূমিকার জন্য। যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলো-মানুষ ফুরসত পেলো অধিক থেকে অধিকতর ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত হতে। সুতরাং রসুলে করীম (সাঃ) এর সাহস একটি পজেটিভ বিষয়-যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হতে সাহায্য করেছে। এ বিষয়টি আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন, “হে ঐ যারা ঈমান এনেছে, তোমরা যখন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন দৃঢ় থাক; আর বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ কর যেন তোমরা উন্নত হতে পার।”(সূরা আনফালঃ ৪৫)।

মানুষ যখন অভাবী থাকে না, শক্তিশালী হয় তখন সে মানসিক প্রশান্তি লাভের উপায় খোঁজে। আর সেই শান্তি পাওয়া যায় আল্লাহর যিকিরে। বিষয়টি উপরোল্লিখিত প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। আল্লাহর যিকিরেই রয়েছে মনের শান্তি। সুতরাং ঈমানদারদের উচিত সকল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আদায়ের পর-আরো কিছু নফল আদায় করা। যাদের অর্থবিত্ত আছে, তারা দান খয়রাত করবে। যারা সাহসী তারা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নে ও বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে

রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে কাজ করবে। আর যারা একান্তই আল্লাহ প্রেমিক তারা যিকির শুগুলে লিপ্ত হবে। যিকির শুগুল অনেক রকম হয়ে থাকে। এজন্যেই সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি শাখা বা তরীকা তৈরী হয়েছে। এগুলো হলো-চিশতিয়া তরীকা, কাদেরীয়া তরীকা, নকশবন্দী তরীকা, ও সোহরাওয়ারদিয়া তরীকা। যারা আল্লাহকে হৃদয়ের মাঝে আবিষ্কার করতে চান তাদের জন্য উচিত হবে-একজন খাঁটি পীর বা শায়েখের হাতে বায়আত নিয়ে ঐ চার তরীকার কোন একটি বা একাধিক তরীকায় যিকির শুগলে লিপ্ত হওয়া।

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরে প্রশান্তি আসে। শান্তির অভাব আর থাকে না। শায়েখ বা পীরের সংসর্গ নেয়ার জন্য আল্লাহ আল কুরআনে বলেন, “যারা ঈমান এনেছ-তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।” এখানে সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার মানে বুঝতে হবে এই যে, আমরা যেন ওলী- আল্লাহদের সান্নিধ্যে যাই, তাদের কাছ থেকে ইসলাম শিখি এবং শিখি কীভাবে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। অন্যকথায় ইবাদাত বন্দেগীতে উন্নতি লাভ করে অন্তরে শান্তি আনয়নের জন্য পীর বা শায়েখের সঙ্গ লাভের জন্যই আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

৬. শান্তির প্রধান উৎস

মানবজীবনে শান্তির প্রধান উৎস আল্লাহর বন্দেগী। এজন্যে রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যা মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব। প্রতি ওয়াক্ত সালাতেই রয়েছে সুন্নত নামাজ, ঈশার সালাতের পর রয়েছে ওয়াজিব বিতর নামাজ। সালাত আদায় করেই শেষ হয়ে যায় না ইবাদাত। রয়েছে রামাদান মাসব্যাপি একমাস ফরজ সিয়াম পালন। শরীর সুস্থ থাকলে এবং সেসাথে আর্থিক সামর্থ্য থাকলে জীবনে একবার হজ্ব পালন অন্যতম এক ইবাদাত। নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলে-যাকাত আদায় করতে হবে।

এই ইবাদাত সমূহ ইখলাসের সাথে আদায় করা হলে মনে আরো অগ্রসর হবার প্রেরণা জাগে। সেই প্রেরণা প্রশমনের উপায় আমাদের সর্দার নবী করীম (সাঃ) বাতলে দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বপ্রধান হলো প্রতি রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়। তাহাজ্জুদ মুমিন জীবনের এক অভাবনীয় সম্পদ। এর মাধ্যমে আল্লাহপাকের যত নিকটবর্তী হওয়া যায় তা অন্য কোন ভাবে হয় না।

এরপর রয়েছে-কুরআন তেলাওয়াত। কুরআন তেলাওয়াত নফল ইবাদাতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান ইবাদাত। কুরআন তেলাওয়াত হলো- আল্লাহপাকের সঙ্গে কথোপকথন। যারা আরবী শিখে-কুরআন তরজমা ও তাফসির শিখে-কুরআন তেলাওয়াতে নিয়মিত লিপ্ত হবেন-তাদের জীবনই হলো সর্বোত্তম জীবন।

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে শান্তি জীবনে নেমে আসে তা বলে কয়ে বুঝানো যাবার মত নয়। যারা এ আমল করেন তারাই কেবল বলতে পারবেন কুরআন তেলাওয়াতে কী অভূতপূর্ব শান্তি মিলে।

অতঃপর রয়েছে যিকির। অর্থাৎ আল্লাহর নামের স্মরণ। চিশতিয়া তরীকায় ছয় তসবিহের যিকির, বার তসবিহের যিকির বাতানো হয়। সালেক যখন নিয়মিত এই যিকিরগুলো করে তার সকল ভয়, শংকা, অশান্তি দূর হয়ে যায়। আর সে একটু করে হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম ভালোবাসা অনুভব করে। অর্থাৎ সে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে থাকে।

এজন্যে সকল সূফী তরীকায় নিয়মিত আদায়ের জন্য বিভিন্ন তাসবিহ রয়েছে। তবে সর্বপ্রধান যিকির হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" যিকির। বার তসবিহে রয়েছে প্রথমেই দুইশত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির।

বস্তুতঃ মানব জীবনের প্রধান বাস্তবতা হলো- আল্লাহই সব। যত প্রয়োজন আছে সবই আল্লাহ পূরণ করেন। যত সমস্যা আছে সবই আল্লাহই সমাধান করেন। যত দুঃশ্চিন্তা আছে তা আল্লাহই দূর করেন। আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই-এই সত্য যে উপলব্দি করে তার জীবন পাল্টে যায়। সে অধিক থেকে অধিকতর যিকির শুগলে লিপ্ত হয়। তবে যিকির আযকার নিয়মিত নির্ধারিত সময়ে আদায় করায় বরকত বেশী। তাই দিনযাপনের রুটিন দরকার হয়। ফজর নামাজের পর কী নফল ইবাদাত করব, যোহরের পর কী, আসরের পর কী বা পূর্বে কী, এসবের একটি রুটিন বানিয়ে সে অনুযায়ী আমল করা উচিত। তখন সকল অশান্তি দূর হয়ে মুসলিমের জীবনে প্রশান্তি নেমে আসে। ফলকথা, আল্লাহর স্মরণেই শান্তির প্রধান উৎস লুকিয়ে আছে। একে উন্মোচিত করা উচিত। আর সময়ের মূল্য দিয়ে আল্লাহর নামের যিকির, সালাত, সিয়ামে রয়েছে মানুষের দুনিয়া আখেরাতের সাফল্য। এই বিষয়টি যত দ্রুত একজন মুসলিম বুঝবে আর কাজে নেমে পড়বে সেই সফল মুমিন।

৭. আল কুরআন পাঠের আদব

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আমি চিশতিয়া তরীকার মহান বুযুর্গ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) লিখিত 'যিয়াউল কুলুব' কিতাবের বাংলা অনুবাদ থেকে নিচ্ছি।

হযরত (রহঃ) বলেন, সুলুক ইলাল্লাহ বা আল্লাহকে পাবার পথে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কালিমা-এ তায়্যিবা ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ- এর যিকির।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত।
তৃতীয়তঃ নামায। বাকী অন্যান্য বিষয় এগুলোরই কোন না কোনটির অন্তর্ভূক্ত। কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা দ্বারা উক্ত বিষয়সমূহের ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রমাণিত।

কুরআনে কারীমের ফযীলত সম্পর্কে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, এর তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হুযুরী (উপস্থিতি) এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়।

কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের নিয়মঃ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মহান একটি ইবাদাত। ফরয বিষয়গুলো ব্যতিত এর চেয়ে উত্তম ও বড় ইবাদাত আর কিছু নেই। এটির মুস্তাহাব ও আদবসমূহ হলোঃ পাক-পবিত্রতা অর্জন করার পর, পূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে কাবার দিকে মুখ করে আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ পাঠ করে খুশু-খুজু, বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে তারতীল সহকারে তেলাওয়াত শুরু করবে। ধ্যান করবে যে, আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি। তাঁকেই আমি প্রত্যক্ষ করছি। এতটুকু ধ্যান করা যদি মুশকিল হয় তবে ধ্যান করবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। তিনি নিষেধাজ্ঞা ও অনুজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশ দিচ্ছেন। সুসংবাদের আয়াত তেলাওয়াতের সময় উৎফুল্ল হবে। ধমক বা ভীতির আয়াত তেলাওয়াতের সময় ভীত হবে। সুউচ্চ আওয়াজে, সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত শুরু করবে। এই হলো সাধারণ তেলাওয়াত পদ্ধতি।

এর বিশেষ তরীকা হলো-উল্লিখিত তরীকা সমূহের প্রতি তো লক্ষ্য রাখবেই, অধিকন্তু

(১) নির্জনে আদব সহকারে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে বসবে। কুরআন শরীফ সামনে রেখে আল্লাহর কালামের বড়ত্ব ও নিজের হীনতার কথা খেয়াল করবে এবং জাহেরী ও বাতেনী আদবের মশক করবে।

সকল ধরণের খেয়াল হতে মনকে মুক্ত করে কুরআনের হাকীকত ও মূল তাৎপর্যের প্রতি ধ্যানস্থ হবে এবং কিছু সময় এই ধ্যানেই কাটাবে যেন এতে ইতমিনান ও মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয়ে যায়। আর ছাত্র যেমন শিক্ষকের সামনে অবস্থান করে তেমনি ধরণের হুযুরে হক তায়ালা তাহারও যেন অর্জিত হয়ে উঠে। পরে আউবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ পূর্ণ পাঠ করে তারতীল এবং তাজবীদ সহকারে শিক্ষক যেমন ছাত্রের সামনে পাঠ করে সেভাবে তেলাওয়াত শুরু করবে। তেলাওয়াতের সময় কেরাত পাঠের সকল নিয়ম প্রণালী যথাযথ আদায় করতে গিয়ে কোনরূপ ত্রুটি হতে দেবে না । মুখের যবানের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক মনের যবানেও এটি পাঠ করছে বলে ধ্যান করবে। এই ধ্যান হতে বিন্দুমাত্র উদাসীন হবে না। যদি কখনো উদাসীনতা এসে যায় তবে তখন তখনি আউযুবিল্লাহ পড়ে একাগ্রতা হাসিল করে নিবে।

(২) উপরোক্ত ধ্যানের মশক করার মাধ্যমে যখন পূর্ণ মানসিক স্থিতি এবং হুযুরে হক তায়ালা অর্জিত হয়ে যাবে তখন এই ধ্যান করবে যে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যেন কুরআন তেলাওয়াত করছে।

(৩) উপরোক্ত ধ্যানে পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হলে পরে ধ্যান করবে যে, খোদ আল্লাহ পাক আমার যবান দ্বারা এটি পাঠ করছেন এবং তিনি এটি শুনছেন। খেয়াল করবে যেন আল্লাহ এই পাঠকে খোদ তাঁহারই কর্ণে শ্রবণ করছেন।

(৪) এভাবে ধ্যানে পূর্ণতা অর্জনের পর ধ্যান করবে যে, আল্লাহ নিজেই পাঠ করছেন এবং নিজ কর্ণেই এই পাঠ শ্রবণ করছেন। মাঝে এই তেলাওয়াতকারী এবং পৃথিবীর অন্য কিছুর কোনই অস্তিত্ব থাকবে না। পাঠকারীর ধ্যান থেকে সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সকল দিক থেকে কেবলমাত্র ঐ একটি আওয়াজই গুঞ্জরিত হতে শুনবে। আর এতেই সে আত্মবিমোহিত হয়ে থাকবে।

এই স্তরে যখন সে পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, তখন আশা করা যায়, কুরআনে কারীমের মূল তাৎপর্য ও রহস্য তার সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে সক্ষম হতে পারবে।

৮. যিকির ও মুরাকাবা

আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান সালেকের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করার পর ও অন্যান্য ব্যস্ততার সময় কমিয়ে কিছু যিকির করা।

(ক) যিকির পদ্ধতি

(১) বাদ ফজর সালেক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন প্রতিদিন পাঠ করবে। বেশী হলে ভালো, তবে যতটুকু সাধ্যে কুলায় ততটুকু পূর্ববর্তী অধ্যায়ের নিয়মানুযায়ী পাঠ করবে।
অতঃপর ছয় তসবিহ আদায় করবে। ছয় তসবিহ হলো- ১০০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০০ বার আলহামদুলিল্লাহ, ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহু আকবার, ১০০ বার ইসতেগফার ও ১০০ বার দরূদ মন লাগিয়ে পড়া।

এই ছয় তসবিহ আবার বাদ মাগরিব আদায় করা চাই।

(২) ইসমে যাতের যিকিরঃ সালেক নিজ সুবিধাজনক সময়ে নির্জনে বসে কমপক্ষে ৩০০০ বার আল্লাহ, আল্লাহ যিকির করবে।
এই যিকিরের একটি সুন্দর পদ্ধতি হলো “আল্লাহু আল্লাহ” যিকির করা অর্থাৎ প্রথম আল্লাহ শব্দটি শেষে ‘হু’ এবং দ্বিতীয় বারের আল্লাহ শব্দটির শেষ অক্ষরে জযম ব্যবহার করা।

(৩) পাস-আনফাসঃ সূফীগণের পরিভাষায় পাস-আনফাস হচ্ছে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় সময়েই সরবে বা নীরবে আল্লাহর যিকির করা। শ্বাস গ্রহণ করার সময় কেবল শ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ বলবে আর শ্বাস বাহির করার সময় ‘হু’ বলবে। এই যিকিরে এত দৃঢ়তা ও নিয়মানুবর্তিতা দরকার যে, এর মাধ্যমে শ্বাস আপনা থেকেই ইচ্ছা ছাড়াই যেন যিকির করতে লেগে যায়।

(৪) বার তাসবিহঃ যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়েন তারা তাহাজ্জুদের পর আর যারা এতে অপারগ তারা এশার নামাযের পর বার তাসবিহের যিকির করবেন। এই যিকিরটি মূলতঃ তেরো তসবিহ কিন্তু মশহুর বার তাসবিহ হিসেবে। এটার নিয়ম হলোঃ সুনির্দিষ্ট কয়েকবার ইসতেগফার ও দরুদ আদায়ের পর ১বার সূরা ফাতেহা ও ৩বার সূরা ইখলাস পাঠ করে পুনরায় দরূদ পাঠ করে মুনাজাত করা। অতঃপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে

প্রথমে ২০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিলে জরব লাগিয়ে ও ৪০০ বার ইল্লাল্লাহ যিকির করা। ইল্লাল্লাহ যিকিরের সময় মনের ভাবটি থাকবে এমন যে-"তাই শুধুই আল্লাহ"। অতঃপর ৬০০ বার আল্লাহু আল্লাহ যিকির করা দিলে ও রূহে জবর লাগিয়ে। এই হলো বার তাসবিহ। তবে ভুলত্রুটি হয়ে গেছে মনে করে আরো ১০০ বার কেবল 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করা। এই যিকির চিশতীয়া তরীকার প্রাণ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর এই যিকির করার মাধ্যমে সালেক আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে যায়।

খ) মুরাকাবার বর্ণনা

সালিক যখন জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকারের নূরে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং তার শিরা উপশিরায় যিকিরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে আত্মবিস্মৃতির এক দশার উদ্ভব হয়। এ সময়েই তাকে মুরাকাবা ও ধ্যানে লেগে পড়া উচিত।

মুরাকাবা কয়েক প্রকার। প্রথম পদ্ধতিঃ দুই জানু হয়ে বসে দু'হাটুতে মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু হতে মনকে বিমুক্ত করে একান্ত ধ্যানে আল্লাহর দরবারে নিজেকে হাজির করে 'আউযু বিল্লাহ' ও 'বিছমিল্লাহ' পড়ার পর "আল্লাহু হাদিরী, আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু মায়ী" পাঠ করবে এবং একাগ্রচিত্তে এগুলোর মর্ম ধ্যান করবে। ধারণা করবে, "আল্লাহ তায়ালা সব সময়েই হাযির রয়েছেন; সতত তিনি আমার সঙ্গী"। এই ধ্যানে এত মগ্ন হবে যে; আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু এমনকি স্বীয় অস্তিত্বের খেয়ালও যেন তার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মুরাকাবাঃ এই মুরাকাবায় আল্লাহর দর্শনের ধ্যান করা হয়। "আলাম ইয়া'লাম বি আন্নাল্লাহা য়ারা" অর্থাৎ "ইহারা কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন।" এই আয়াতের উপর গভীর লক্ষ্য নিবদ্ধ করবে। সবসময় এই ধ্যান অন্তরে জাগরুক রাখবে, যেন ক্রমে তার মধ্যে ঐ পরম সুরতকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় মুরাকাবাঃ এটি হলো মুরাকাবা-এ ফানা বা স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ধ্যান। আল্লাহ পাক বলেন "পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে কেবলমাত্র মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী আপনার প্রভুই বিরাজিত থাকবেন।" এই আয়াত মর্মে ধ্যান করবে যে, সবকিছুই একদিন ফানা হয়ে যাবে আর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ থেকে মুক্ত আল্লাহ পাকই সর্বদা বিরাজিত থাকবেন। মানসচক্ষে এই অবস্থাটি অবলোকন করবে এবং এই ধ্যানেই নিমগ্ন হয়ে থাকবে। এতে করে স্বীয় অস্তিত্বের অনিত্যতা এবং স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির অক্ষমতা ও বিলুপ্তি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। এ সকল মুরাকাবাই মূলতঃ সালিকদের জন্য যথেষ্ট। তবে আরো অনেক মুরাকাবা ও বিষয় ও পদ্ধতি রয়েছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করে এখানেই থামছি

৯. সমাপনী বক্তব্য

মানবজীবনের উদ্দেশ্য সবাই একরকম মনে করে না। ইসলামী সমাজে মুসলিমদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই একমত। সেটি হলো-এই দুনিয়ার জীবন-আল্লাহ দিয়েছেন কে ভালো কর্ম করে আর কে মন্দকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা পরখ করার জন্যে। ভালো মন্দ উভয়ের জন্য আল্লাহতায়ালা পরিক্ষার ফল নির্ধারণ করে রেখেছেন। ভালো কর্মে লিপ্ত মুসলিমরা ইসলামের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেন। তাদের যদি সমস্যা হয়; কষ্ট ও অশান্তি দেখা দেয়-তবে সেগুলো দূর করার জন্যই আল্লাহর সন্তুটি লাভের চেষ্টা করা। আর আল্লাহ যখন সন্তুষ্ট হয়ে যান-জীবন থেকে অশান্তি দূর হয়ে যায়। নেমে আসে শান্তি। জীবন হয় শান্তিময়। সুতরাং ইসলামী জীবনের উদ্দেশ্যই হলো-দুনিয়াতে শান্তি লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। অতঃপর মৃত্যু যদি আল্লাহর দয়ায় ইসলামের উপর ঈমানের সাথে হয় -তবে কবর জীবন হবে শান্তিময়।

আল্লাহ এই জগত একদিন ধ্বংস করে নতুন জগতের পত্তন করবেন। সেই জীবনের শান্তিময় জান্নাতে প্রবেশ করবে ও অনন্তকাল সেখানে থাকবে যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে দুনিয়ার শান্তির জীবন কাটিয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুমিনের জীবনে অশান্তি নেমে আসতে পারে। তখন অধিকতর ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হতে হবে। এতে ধীরে ধীরে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত হবে মুমিনের জীবনে।

নফল ইবাদাত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অনন্য মাধ্যম। আর নফল ইবাদাত সুন্নত ইবাদাতের রক্ষা কবচ, সুন্নত ফরজ ওয়াজীবকে রক্ষা করে। সুতরাং নফলের গুরুত্ব অপরিসীম। নফল ইবাদাতের মধ্যে কুরআন বুঝে তেলাওয়াত করা, কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা করার স্থান অনেক উর্ধ্বে। কুরআন চর্চ্চা, কুরআন হেফজ করা, যতটুকু হোক, শান্তির অনন্য উপায়। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় আমি এই মেসেজটিই পাঠককে দেয়ার চেষ্টা করেছি যে-কুরআনকে আকড়ে ধরুন। আরবী ভাষা শিখুন, কুরআন বুঝুন আর চর্চ্চা করুন এতে উদ্ধৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান। কুরআন নিয়ে সময়ের অনেকটাই কাটান। দেখবেন জীবন শান্তিময় হয়ে গেছে। শান্তির অভাব অমুসলিমদের মধ্যেই বেশী। মুসলিমদের অধিকাংশই শান্তিময় জীবন পেয়ে থাকেন।

আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান ও ইহসান অবলম্বনের তৌফিক দিন, বাস্তবেই মুসলিম হবার তৌফিক দিন এবং আমাদের জীবনকে করুন শান্তিময়।

আল্লাহকে কখনো ভুলা যায় না। আল্লাহর সৃষ্টির তুলনা হয়না। আল্লাহর দান অবারিত। আস্তিক নাস্তিক কেউই আল্লাহর দান থেকে মাহরুম হয়না। আমাদের জীবনে আল্লাহর ভূমিকা কেউ অস্বীকার খরতে পারবে না। শান্তি পেতে হলে আল্লাহর দ্বারস্ত হতেই হবে।